ঢাকা থেকে নীলডুমুর - সুন্দরবনে কিছুক্ষন

শোভন শামস

কমলাপুর ও খুলনা ষ্টেশনে

এপ্রিলের আবহাওয়া বেড়ানোর জন্য তেমন আদর্শ না হলেও সুযোগ যেহেতু পেয়ে গেলাম তাই ঢাকা থেকে খুলনার উদ্দেশ্যে যাত্রা পরিকল্পনা সুরু করলাম, এ যাত্রা বাসে না গিয়ে ট্রেনে যাব ঠিক করলাম । ঢাকা-খুলনা এসি বাস আছে এবং টিকিটও সহজেই পাওয়া যায়। ঢাকা-খুলনা সুন্দরবন এক্সপ্রেস ট্রেনে করে যাওয়া ঠিক হলো। এসি ফোরবার্থের টিকিট পেয়ে গেলাম। আমার দুটো পরিবার এবার ভ্রমনে বের হয়েছি। সুন্দরবন এক্সপ্রেস সকাল ছয়টা বিশ মিনিটে কমলাপুর থেকে ছাড়ে। বাচ্চাদের অত ভোরে উঠতে অসুবিধা হবে তাই আগের রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমাতে পাঠালাম। গাড়ীতে খাবারের নাস্তা ওদের মা বেশ সুন্দর ভাবে গুছিয়ে নিল। সময় মত ষ্টেশনে গিয়ে জানলাম ট্রেন আরো ঘন্টা দেড়েক পরে আসবে। এসি ওয়েটিং রুমে বসে রইলাম, এর রক্ষনাবেক্ষন অতি সাধারন মানের অথচ একটু দেশপ্রেম কিংবা আন্তরিকতা হলেই অনেক উন্নত মানের ভ্রমন উপহার দিতে পারে দেশবাসীকে কিংবা বাংলাদেশ দেখতে আসা পর্যটকদেরকে ।

অবশেষে ট্রেন আসল। কুলি ঠিক করা ছিল। জিনিস পত্র আমাদের কমপার্টমেন্টে এনে দিল। এসি কমপার্টমেন্ট, একসময় এগুলো ঝকঝক করত এখন একটা সুইপার ফিনাইল দিয়ে টয়লেট পরিস্কার করে কোনমতে রুমে একটু ভেজাপাটের ঝাড়ু দিয়ে গেল। সোফা গুলোতে ময়লা রয়ে গেছে, যাক নিজেরা পরিস্কার করে বসলাম। এই বগিতে যাত্রিদের জন্য এটেনডেন্ট আছে । সেখানে ট্রেনের বদনাম না করে একটা দিক ভাল লাগলো যে রুমের সাথে এটাচড বাথরুম, সেখানে টয়লেট পেপারও আছে। তবে গোটা বগিতে তিনটার মতো কামরাতে যাত্রী, বাকীগুলো খালি অথচ টিকিট নেওয়ার সময় জানতাম সবটিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। ইঞ্জিন লাগার পর এসি চালো হলো। ঠান্ডা বাতাসে দু ঘন্টা লেইট ও অন্যান্য কষ্ট গুলো আসতে আসতে কমে গেল।

সাড়ে আটটার দিকে ট্রেন ছাড়লো। গরমের দিন হলেও সূর্যের আলো তখনও অদুরে, গরমভাব ছিল না, এসির মধ্যে এ আলোটাই ভাল লাগলো। কমলাপুর রেল ষ্টেশনে ট্রেনের দুপাশের যেই পরিচিত দৃশ্য, আরো নান্দনিক এলাকা বানানো যেত এই জায়গাগুলোকে। কে খেয়াল রাখে। লাইনের দুপাশে ধুলি উড়িয়ে সুন্দরবন এক্সপ্রেস সুন্দরবনের নগর খুলনার উদ্দেশ্যে ছুটে চলল। এয়ারপোট ও জয়দেবপুর ষ্টেশন পর্যনত্ম সেই পুরানো সব দৃশ্য জয়দেবপুর থেকে নতুন লাইন টাঙ্গাইল হয়ে বঙ্গবন্ধু যমুনা ব্রীজ পর্যন্ত চলে গেছে। এই লাইন দিয়ে ব্রডগেজ ও মিটার গেজ উভয় ট্রেন চলতে পারে। নতুন বড় ষ্টেশন হয়েছে টাংগাইল তাছাড়া মৌচাক ও অন্যান্য কয়েকটা ষ্টেশন ও আছে। এখানে মাঝে মাঝে ট্রেন থেমে একটা দুটো আপ বা ডাউন ট্রেনকে পাশ দিল।

বঙ্গবন্ধু যমুনা ব্রীজ

বিজেএমবিতে উঠে ট্রেনের গতি কমে গেল। কোথায় সেই প্রমত্তা যমুনা, ব্রিজের নীচে চিকন খালের মত যমুনার অংশ তার পাশেই চর। চরের বালি ঢেউ খেলানো যেন নদীর ঢেউ বালিতে তার ছাপ রেখে গেছে। চরে শনের ক্ষেত, অসমতল ভূমি দেখতে দেখতে এগিয়ে যাচ্ছে ট্রেন লাইনের পাশে ট্রেন। পাশ দিয়ে উত্তর বঙ্গগামী বাস ট্রাক চলছে। আবার একচিলতে যমুনা তারপর ব্রিজটা উত্তর বঙ্গে গিয়ে শেষ । দুপাশের প্রকৃতি এখন একটু অন্য রকম। ট্রেনের দুধারে যেন ফাঁকা ধানের মাঠ, সবুজ ধান ফসল আসবে আসবে। দুরের গ্রামগুলো গাছ পালায় ছায়াঢাকা। কৃষক ধানক্ষেতের পাশে বিশ্রাম নিচ্ছে, কেউ কাজ করছে। পানি এখন উঠে পাম্প মেশিনে, পানি দেয়া হয়েছে ক্ষেত গুলোতে। সিরাজগঞ্জ, পাবনার পাকশি তারপর ট্রেন চলবে দক্ষিন বাংলার দিকে, পথে উত্তর বাংলার অনেক ট্রেন ষ্টেশন।

হার্ডিঞ্জ ব্রিজ

পাকশি ষ্টেশন পার হয়ে ট্রেন বিখ্যাত হার্ডিঞ্জ ব্রিজের উপর, নীচে একসময় ছিল প্রমতা পদ্মা। এখন তার কিছুই নেই। যেন চকচক করে বালু কোথাও নাই কাঁদা । হার্ডিঞ্জ ব্রিজের প্রায় সমান্তরালে চলে গেছে লালন শাহ ব্রিজ। ব্রিজ দিয়ে বাস ট্রাক চলছে নিজ নিজ গন্তব্যে। ব্রিজ পার হয়ে ভেড়ামারা ষ্টেশন, আমরা দক্ষিন বাংলায় ঢুকে গেছি। দর্শনা, চুয়াডাংগা, কোট চাঁদপুর হয়ে যশোর ষ্টেশন। ট্রেন থামলেই বাচ্চারা জানতে চায় কোন ষ্টেশন, কি আছে এখানে। নতুন অভিজ্ঞতা বাচ্চাদের জন্য। খুলনা আর ঘন্টা দেড়েকের পথ । যশোর ষ্টেশনে ট্রেন কিছুক্ষণ থামল, তারপর আবার পথচলা । খুলনার কাছাকাছি আসতেই বেলা শেষ। মাগরিবের আজানের সময় খুলনা ষ্টেশনে ট্রেন থামল, ষ্টেশন থেকে বাহিরে এসে মসজিদে নামাজ পড়লাম। একটু ঝড়ো বাতাস ছিল তখন। এই দুদিনে যদি আবহাওয়া ভাল না থাকে তাহলে এই ভ্রমনটা মাটি হবে। অনেক আশা নিয়ে এসেছি এবং তা হবে ইনশায়াল্লাহ।

রাতে খুলনা শহর দেখতে বের হলাম, খোলামেলা শহর জানজট মুক্ত নির্মল, ভাল লেগে গেল প্রথমবারেই। ঢাকার দুঃসহ জট এখানে স্বপ্নের মত । খুলনায় থাকার জন্য অনেক হোটেল আছে। ষ্টেশনের পাশে সুন্দরবন ভ্রমনের জন্য কতগুলো বেসরকারী পর্যটন সংস্থার অফিস। এখানে হোটেলের খোজ পাওয়া যায়। ট্যাক্সি কিংবা রিক্সায় হোটেলে যাওয়া যায়। দামও সাধ্যের মধ্যে। পরদিন সকাল বেলা নাস্তা খেয়ে সাতক্ষিরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। সাতক্ষীরা পর্যনত্ম প্রায় দুই ঘন্টা লাগে এবং সেখান থেকে নীলডুমুর আরো ঘন্টা দেড়েকের পথ। বাসে আসলে অবশ্য সময় আরো বেশী লাগে। নীলডুমুরের স্থানীয় নাম বুড়ি গোয়ালিনী, সাতক্ষীরার কালিগঞ্জ পর্যনত্ম অনেক বাস যায় যেখান থেকে স্থানীয় বাহনে বুড়ি গোয়ালিনী যাওয়া যায় । নীলডুমুরের দিকে যতই এগিয়ে যাচ্ছি রাসত্মার দু পাশে ফনিমনসার ঝোপ দেখা যাচ্ছে ।

বাড়ীঘরের কাছেও এ ধরনের ঝোপ যা বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকায় দেখা যায় না । নীলডুমুর এলাকায় ঢোকার সাথে সাথেই প্রকৃতি একটু অন্যরকম । দূরে শাখা নদী, নদীর অন্যপাড় সুন্দরবনের অংশ । রাসত্মার দুপার্শ্বে জলমগ্ন এলাকা, চিংড়ী চাষে লেগে গেছে । লবনাক্ততা চাষাবাদের জন্য অনুপযোগী হলেও এই লবনপানির জলাবদ্ধতা চিংড়ী চাষের উপযুক্ত জায়গা । এখানেও বাড়ীঘর ও রাসত্মার পাশে ফনীমনসার ঝোপ দেখলাম ।

পর্যটনের জন্য স্থানীয় এনজিও বর্ষা মোটেল বানাচ্ছে । তাছাড়া শাখা নদীর পাড়ে ছোট ছোট গোলঘর বানানো আছে । যেখানে বসে থেকে এক দৃষ্টিতে সুন্দর বনের সোভা দেখা যায় দিন রাত । এছাড়াও তাদের আছে ছোট ছোট বোট/লঞ্চ। এসব লঞ্চে সুন্দর বনের ভিতরে ভ্রমনের ব্যবস্থা করে থাকে । মোটামুটি এসময় পর্যটকের ভিড় না থাকলেও সুন্দরবনের টানে অনেক পর্যটক এখানে বেড়াতে আসে ।

ঘোলাপেটুয়া নদী

বিকেল বেলা সুন্দরবন দেখার পালা । দুপুরে রোদের প্রচন্ড তাপে বাইরে যাওয়ার কথা চিনত্মাও করিনি । ঘোলাপেটুয়া নদীর ঘাট থেকে রওয়ানা হলাম সুন্দরবন দেখতে । নদীর দুপাশ থেকে অসংখ্য শাখা শিরা উপশিরার মত ছড়িয়ে গেছে । ভাটার সময় বলে এগুলোতে পানি ছিল না তবে জোয়ারের সময়ে এগুলোতে পানি থাকে । ভেজা দুইকুল দেখেই তা বোঝা যায়, নদীপথে ৪৫ মিনিট চলার পর বন বিভাগের টহল ফাঁড়ির জোট দেখা গেল । যাত্রা পথে বুড়ি গোয়ালিনী বাজার দেখলাম । এই বাজারের ঘাট থেকে যন্ত্রচালিত নৌকায় সৌখিন পর্যটকরা সুন্দরবনে ঘুরতে যায় । ঘাটে এ রকম কতগুলো নৌকা বাঁধা আছে । কলাগাছিয়া টহলফাঁড়ি এবং ইকো টুটিজম কেন্দ্রে বোট ভিড়ালাম । সিড়ি বেয়ে উপরে উঠে ব্রিজের মত পাটাতনের উপর দিয়ে হেঁটে ফরেষ্ট অফিসে যেতে হয় ।

কলাগাছিয়া টহলফাঁড়ি এবং ইকো টুটিজম কেন্দ্র

বনবিভাগের লোকজন এখানে থাকে । টিকিট করে এখানে বেড়ানোর ব্যবস্থা আছে নামমাত্র দাম । ইনচার্জ আমাদেরকে জানালো বাঘ ও এখানে মাঝে মাঝে আছে এবং হরিনের অভয়ারন্য এটা, মাটিতে অনেক হরিনের পায়ের চাপ দেখলাম । বাচ্চারা গোলপাতা গাছ দেখার জন্য উৎসুক নারকেল পাতার মত পাতাকে গোলপাতা নাম এটাই তারা ভেবে পায়না । সুন্দরী, কেওড়া ইত্যাদি নানা ধরনের গাছ এখানে । বনবিভাগ পর্যটনের জন্য সুন্দর ওয়াকওয়ে বানিয়ে দিয়েছে । ধন্যবাদ জানাই দুরদর্শী সেই বন কর্মকর্তাকে ।

ওয়াকওয়ে কলাগাছিয়া টহলফাঁড়ি এবং ইকো টুটিজম কেন্দ্র

ওয়াকওয়ের একদিক দিয়ে যাত্রা শুরু করলে সুন্দরবনের গাছপালা, হরিনের পায়ের ছাপ, জোয়ার ভাটার চিহ্ন, কৃত্রিমভাবে বানানো মিষ্টি পানির আধার এগুলো সব দেখতে দেখতে আবার নিজ অবস্থানে ফিরে আসা যায়। ওয়াকওয়ের নীচে জোয়ারের পানি আসে, ভাটার সময় পানি নেমে যায় । মিষ্টি পানি খেতে বনের অন্যান্য প্রানী আসে । বাঘ মামারা পানির টানে চলে আসে এখানে । এই নির্জন এলাকায় বন বিভাগের লোকজন মুরগী পালে এবং কাছের বাজার থেকে তাদের প্রয়োজনীয় জীবন উপকরন সংগ্রহ করে আনে । চোরাকারবারী বা বনদস্যুদের হটাতে তাদের ইঞ্জিন চালিত বোট আছে । তবে এটা দিয়ে দ্রুত গামী দস্যুর বোট ধাওয়া করা বেশ কষ্টকর । সন্ধা হয় হয় করছে, সূর্য পশ্চিমে ঢলে পরছে । সুন্দরবনের জালের মতো বিছানো ছোট ছোট খাল ও বনের গাছপালায় ফাক দিয়ে সূর্যাসত্ম দেখতে দেখতে বোটে চড়লাম । আলো থাকতে থাকতে বুড়ি গোয়ালিনী ঘাটের দিকে রওয়ানা দিলাম । বাচ্চারা বাংলাদেশের প্রাকৃতিক লীলাভূমি সুন্দরবন দেখে মুগ্ধ হলো । এটা এক নতুন অভিজ্ঞতা ।

বুড়ি গোয়ালিনী এলাকা, সাতক্ষীরা

সন্ধায় ফেরত এসে আবার নদীর ঘাটে গেলাম জোয়ার দেখার জন্য, আকাশে হালকা চাঁদের আলো, নদীর ঘাটে সোঁ সোঁ শব্দে বাতাস বয়ে যাচ্ছে । নদীতে জোয়ারের পানির ছলাত ছলাত শব্দ । জোয়ারের সময় কিভাবে পানি বাড়ে তাদের বিশ্বাস হচ্ছে না, তাই তারা ঘাটের সিড়ির দিকে খেয়াল করছে বেশ মনোযোগ দিয়ে । একটু একটু করে পানির সিড়িগুলো ডুবিয়ে দিচ্ছে আর তাদের আগ্রহ আরও বাড়ছে, একসময় অনেক কাছে জোয়ারের পানি এসে গেল, নদীর এই জোয়ার ভাটার অভিজ্ঞতাও তাদের কাছে নতুন, যদিও কক্সবাজারের সমুদ্রতীরে তারা দেখেছে । রাত বাড়ছে তাই রেষ্ট হাউজে ফিরে এলাম । পরদিন সকালে ফিরতি যাত্রা খুলনার উদ্দেশ্যে সাতক্ষিরা হয়ে রওয়ানা দিলাম ।

খুলনা শহরের সাতক্ষীরার ঘোষের মিষ্টান্ন ভান্ডার থেকে নতুন নতুন নাম ও ডিজাইনের মিষ্টি কেনা হলো, একটা মিষ্টির নাম ইলিস এটা বেশ হিট হলো, বাচ্চাদের এটা বেশ পছন্দ । সন্ধায় রুপসা ব্রিজ দেখতে বের হলাম, তবে আগে লঞ্চে গেলাম, লঞ্চঘাট খুলনা ষ্টেশনের পাশেই ।

লঞ্চঘাট, খুলনা

রাত হওয়াতে যাত্রী নেই, সুন্দরবন রুপসা গামী পর্যটক ভর্তি দুটো লঞ্চ ঘাটে অপেক্ষা করছে। এরা প্রাইভেট পর্যটন সংস্থার মাধ্যমে প্যাকেজ ট্যুরে সুন্দরবন যাচ্ছে । একটা লঞ্চে অনুমতি নিয়ে উঠলাম, ঢুকতেই খাবার ঘর, রাতে বিরিয়ানী খাচ্ছিল যাত্রীরা । দোতালায় উঠে কেবিনগুলো দেখলাম, পর্যটকরা তাদের রুমে আরাম করছে, সকাল নাগাদ লঞ্চ ছেড়ে যাবে । এটা কটকা ও হিরন পয়েন্ট হয়ে আবার এখানেই ফিরে আসবে ।

রুপসা ব্রিজ

লঞ্চ ঘাট থেকে রুপসা ব্রিজের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম, রাসত্মা প্রায় ফাঁকা, ব্রিজের এপ্রোচ রোড চমৎকার । সুন্দর ও নান্দনিক ব্রিজ এলাকা, আলো জ্বলজ্বল করছে । টোল প্লাজার ওপারে না গিয়ে এপারেই গাড়ী ঘুরিয়ে নিয়ে কিছুক্ষন দাড়ালাম, নীচে নদী বয়ে চলছে । নদীতে সেই চিরপরিচিত নৌকায় টিমটিম করে আলো জ্বলছে, যন্ত্রচালিত নৌকা শব্দ করে রাতের আধারে নদীর বুক চিরে গনত্মব্যে যাচ্ছে । ব্রিজের উপর সুন্দর বাতাস কিছুক্ষন থেকে ফিরে চললাম । ঢাকা থেকে খুলনা হয়ে সুন্দরবন দেখার চমৎকার অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে আসলাম । সেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল বলে সুন্দরবন ভ্রমন এখন তেমন কষ্টসাধ্য নয়। একটা ছোট গ্রুপে বেশ মজা করে প্যাকেজ প্রোগ্রামের আওতায় সুন্দরবন দেখা যায় । দেশকে দেখুন, আমাদের দেশ অনেক সুন্দর । আসুন আমরা তাকে আরও সুন্দর করি ।

shovonshams@yahoo.com